كشف الشبهات

সংশয় নিরসন

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত তামিমি
(রাহিমাহুল্লাহ)

প্রথম অধ্যায়
রাসূলগণের প্রথম দায়িত্বঃ ইবাদতে আল্লাহর একত্বের প্রতিষ্ঠা

প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাওহীদের অর্থ ইবাদতকে পাক পবিত্র আল্লাহর জন্যই একক ভাবে সুনির্দিষ্ট করা আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের দ্বীন- যে দ্বীনসহ আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।

সেই রাসূলগণের প্রথম হচ্ছেন নূহ (আঃ)। আল্লাহ তাঁকে তার কাওমের নিকট সেই সময় পাঠালেন যখন তারা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামীয় কতিপয় সৎ লোকের ব্যাপারে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে চলেছিল।

আর সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) যিনি ঐ সব নেক লোকদের মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। আল্লাহ তাঁকে এমন সব লোকের মধ্যে পাঠান যারা ইবাদত করত, হজ্জ করত, দান খয়রাত করত এবং আল্লাহকেও অধিক মাত্রায় স্মরণ করত। কিন্তু তারা কোন কোন সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ এবং তাদের মাঝে মাধ্যম রূপে দাঁড় করাত।

তারা বলত, তাদের মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি আর আল্লাহর নিকট (আমাদের জন্য) তাদের সুপারিশ কামনা করি। তাদের এই নির্বাচিত মাধ্যমগুলো হচ্ছেঃ ফেরেশতা, ঈসা, মারঈয়াম এবং মানুষের মধ্যে যাঁরা সৎকর্মশীল আল্লাহর সালেহ বান্দা।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ প্রেরণ করলেন মহা-নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনকে নব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করার জন্য।

তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই পথ এবং এই প্রত্যয় একমাত্র আল্লাহরই হক। এর কোনটিই আল্লাহর নৈকট্য লাভে-ধন্য কোন ফেরেশতা এবং কোন প্রেরিত রাসূলের জন্যও সিদ্ধ নয়। অন্যদের কথা পরে!

তা ছাড়া ঐ সব মুশরিকরাও সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিতে তার কোন শরীক নেই। বস্তুতঃ তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা, তিনি ছাড়া রিযিক দেওয়ার আর কেউ নেই। জীবনদাতাও একমাত্র তিনিই, আর কেউ জীবন দিতে সক্ষম নয়। তিনিই মৃত্যু দেন, আর কেউ মৃত্যু দিতে পারে না।

বিশ্ব জগতের একমাত্র পরিচালকও তিনিই, আর কারোরই পরিচালনার ক্ষমতা নেই। সপ্ত আকাশ ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং সপ্তস্তবক যমীন ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সব কিছুই তাঁরই অনুগত দাসানুদাস, সবই তাঁর ব্যবস্থাধীন এবং সব কিছুই তাঁরই প্রতাপে এবং তাঁরই আয়ত্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাওহীদুর রুবুবিয়াত বনাম তাওহীদ ফিল ইবাদত

[রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সব মুশরিকের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তাওহীদে রুবুবিয়াত অর্থাৎ আল্লাহ যে মানুষের রব-প্রতিপালক একথা স্বীকার করত কিন্তু এই স্বীকৃতি ইবাদতে শিরক এর পর্যায় থেকে তাদেরকে বের করে আনতে পারে নাই- আলোচ্য অধ্যায়ে তারই বিশদ বিবরণ দিতে চাই।]

যে সব কাফেরের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যুদ্ধ করেছেন তারা তাওহীদুর রুবুবিয়াতের (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক হিসেবে) সাক্ষ্য প্রদান করতো- এই কথার প্রমাণ যদি তুমি চাও তবে নিম্ন লিখিত আল্লাহর বাণী পাঠ করঃ

> **"**(হে রাসূল) তুমি জিজ্ঞাসা করঃ (হে মুশরিকগণ) যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রুযীর সংস্থান করে দেন কে সেই (পাক পরওয়ারদেগার), কে তিনি যিনি শ্রবণ ও দর্শনের প্রকৃত অধিকারী?
> এবং কে সেই (মহান স্রষ্টা) যিনি জীবন্তকে মৃত হতে আবির্ভূত করেন, আর কেই বা সেই মহান সত্তা যিনি মৃতকে জীবন্ত থেকে বহির্গত করেন? এবং কে সেই (রব পরওয়ারদেগার) যিনি কুদ্রতের সকল ব্যাপারকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন?
> তারা নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিবেঃ আল্লাহ! তুমি বলঃ এই স্বীকারোক্তির পরেও তোমরা সংযত হয়ে চলনা কেন?**"** **(**সূরা ইউনুস **১০: ৩১)**

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

> **"**জিজ্ঞাসা করঃ এই যে যমীন এবং ইহাতে অবস্থিত পদার্থগুলি এসব কার? যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। তারা নিশ্চয় বলবেঃ আল্লাহর। বলঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?
> জিজ্ঞাসা করঃ কে এই সাত আসমানের রব পরওয়ারদেগার? কে মহিমান্বিত আরশের অধিপতি? তারা নিশ্চয় বলবেঃ আল্লাহ। বলঃ তবুও কি তোমরা সংযত হবে না?
> জিজ্ঞাসা করঃ সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুর উপর সার্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে কার? এবং সকলকে আশ্রয় দান করে থাকেন কে? অথচ কারও আশ্রিত হতে হয় না যাঁকে, কে তিঁনি? (বলে দাওঃ) যদি তোমাদের কিছু জ্ঞান থাকে।
> তারা নিশ্চয় বলবেঃ তিনি আল্লাহ, বলঃ তাহলে কোথায় যাচ্ছ তোমরা (সম্মোহিত হয়ে)?**"**
> **(**সূরা মু'মিনুন ২৩: ৮৪-৮৯**)**

অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

যখন এ সত্য স্বীকৃত হলো যে, তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতের গুণাবলী মেনে নিয়েছিল অথচ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে সেই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি - যার প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।

আর তুমি এটাও অবগত হলে যে, যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটা ছিল তাওহীদে ইবাদত (ইবাদতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা) আমাদের যুগের মুশরিকগণ যাকে 'ই'তেকাদ' বলে থাকে।

তাদের ঐ 'ই'তেকাদের' (অন্তর থেকে বিশ্বাস) নমুনা ছিল এই যে, তারা আল্লাহকে দিবানিশি আহ্বান করত আর তাদের অনেকেই আবার ফেরেশতাদেরকে এজন্য আহ্বান করত যে, ফেরেশতাগণ তাদের সৎ স্বভাব ও আল্লাহর নৈকট্যে অবস্থান হেতু তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে; অথবা তারা কোন পূণ্যস্মৃতি ব্যক্তি বা নবীকে ডাকতো যেমন 'লাত' বা হযরত ঈসা (আঃ)।

আর এটাও তুমি জানতে পারলে যে, মহানবী (ﷺ) তাদের সঙ্গে এই প্রকার শির্কের যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন যেন তারা একক আল্লাহর জন্যই তাদের ইবাদতকে খালেস (নির্ভেজাল) করে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

> "আরও (এই অহী করা হয়েছে) যে, মসজিদগুলো সমস্তই আল্লাহর (যিকরের) জন্য, অতএব তোমরা আহ্বান করতে থাকবে একমাত্র আল্লাহকে এবং আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেও ডাকবেনা।"
> (সূরা জ্বিন ৭২: ১৮)

এবং তিনি একথাও বলেছেনঃ

> "সমস্ত সত্য আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য, বস্তুতঃ তাঁকে ছেড়ে অন্য যাদেরকেই তারা আহ্বান করে, তারা তাদের সে আহ্বানে কিছুমাত্রও সাড়া দিতে পারে না।" (সূরা রা'দ ১৩: ১৪)

এটাও বাস্তব সত্য যে, মহানবী (ﷺ) তাদের সঙ্গে এই জন্যই যুদ্ধ করেছেন যেন তাদের যাবতীয় প্রার্থনা আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; যাবতীয় কোরবানীও আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়, যাবতীয় নযর নেয়াযও আল্লাহর জন্যই উৎসৃষ্ট হয়; সমস্ত আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহর সমীপেই করা হয় এবং সর্ব প্রকার ইবাদত আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।

এবং তুমি এটাও অবগত হলে যে, তাওহীদে রুবুয়িয়াত সম্বন্ধে তাদের স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে দেয়নি এবং ফেরেশতা, নবী ও ওলীগণের সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশ লাভের ইচ্ছা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বাসনা এমন মারাত্মক অপরাধ যা তাদের জান মালকে মুসলমানদের জন্য হালাল করে দিয়েছিল।

এখন তুমি অবশ্য বুঝতে পারছ যে, আল্লাহর রাসূলগণ কোন তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন ও মুশরিকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত তাৎপর্য

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদাহ। বর্তমান যুগে ইসলামের দাবীদারগণের তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ের কাফেরগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ বেশী ভাল জানতো। বক্ষমাণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে]

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য বলতে যা বুঝায় তা-ই হচ্ছে তাওহীদে ইবাদত। কেননা তাদের নিকট 'ইলাহ' হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে বিপদাপদে ডাকা হয়, যার জন্য নযর নিয়ায পেশ করা হয়, যার নামে পশু পাখী যবহ করা হয় এবং যার নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়।

কিন্তু এই সব বিষয়ে যদি ফেরেশতা, নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, জ্বিন প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা জানান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরকেই 'ইলাহ' এর আসনে বসান হয়।

নবীগণ কাফেরদেরকে একথা বোঝাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি যে, আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আহার-দাতা এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপক পরিচালক। কেননা কাফেররা এটা জানত এবং স্বীকার করত যে, এই সব গুণাবলী অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহার দান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র একক আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট- আর কারোরই তা করবার ক্ষমতা নেই। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি)

এছাড়া সে যুগের মুশরিকগণ 'ইলাহ' এর সেই অর্থই বুঝত যা আজ কালের মুশরিকগণ 'সাইয়্যেদ', 'মুর্শিদ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। নবী করীম (ﷺ) তাদের নিকটে যে কালেমায়ে তাওহীদের জন্য আগমন করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর এই কালেমার প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য, শুধু মাত্র এর শব্দগুলিই উদ্দেশ্য নয়।

জাহেল কাফেরগণও এ কথা জানত যে, এই কালেমা থেকে নবী করীম (ﷺ)-এর উদ্দেশ্য ছিলঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা (তাঁর সঙ্গে বান্দার একমাত্র সম্পর্ক খালেক ও মাখলুক তথা মা'বুদ ও আব্দের সম্পর্ক), তাঁকে ছেড়ে আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এর থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র রাখা।

কেননা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বলঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- নেই কোন মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, তখন বলে উঠল,

> "এই লোকটি কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য পরিণত করছে? এ তো ভারী এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।"
> **(সূরা সা'দ ৩৮: ৫)**

যখন তুমি জানতে পারলে যে, মূর্খ কাফেরগণও কালেমার অর্থ বুঝে নিয়েছিল, তখন এটা কত বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জাহেল কাফেরগণও কালেমার যে অর্থ বুঝতে পেরেছিল, ইসলামের (বর্তমান) দাবীদারগণ তাও বুঝে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না।

বরং এরা মনে করছে কালেমার আক্ষরিক উচ্চারণই যথেষ্ট, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে অন্তর দিয়ে প্রত্যয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই। কাফেরদের মধ্যে যারা ছিল বুদ্ধিমান তারা এ কালেমার অর্থ সম্বন্ধে জানত যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া নেই কোন সৃষ্টিকর্তা, নেই কোন রিযিকদাতা এবং একমাত্র তিনিই সব কিছুর পরিচালক, সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক।

অতএব, ঐ মুসলিম নামধারীর মধ্যে কি মঙ্গল থাকতে পারে যার চেয়ে জাহেল কাফেরও কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর এর অর্থ বেশী বুঝে?

চতুর্থ অধ্যায়
তাওহীদের জ্ঞান অর্জন আল্লাহর এক বিরাট নি'আমত

[এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় তাওহীদ সম্পর্কে মু'মিনের জ্ঞান লাভ তার প্রতি আল্লাহর এমন এক নে'আমত যে জন্য আনন্দ প্রকাশ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং এর থেকে বঞ্চনা তার জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।]

নিম্নোক্ত চারটি বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর তুমি দুটি বিষয়ে উপকৃত হতে পারবে। বক্তব্য গুলো এইঃ
১. আন্তরিক প্রত্যয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যা তুমি জ্ঞাত হয়েছে।
২. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার ভয়াবহ পরিণতি যে সম্বন্ধে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ

> "নিশ্চয় (জেনো) আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করার যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্য যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর পাপ।" (সূরা নিসা ৪: ৪৮)

৩. প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নবীগণ যে দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছেন সে দ্বীন ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন দ্বীনই কবুল করবেন না।
৪. আর অধিকাংশ লোক দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ।

যে দুটি বিষয়ে তুমি উপকৃত হতে পারবে তা হল এইঃ

একঃ আল্লাহর অবদান ও তাঁর রহমতের উপর সন্তুষ্টি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

> "বল! আল্লাহ এই যে আন'আম এবং তাঁর এই যে রহমত (তোমরা পেয়েছে) এর জন্য সকলের উৎফুল্ল হওয়া উচিত, তারা যা পূঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।" (সূরা ইউনুস ১০: ৫৮)

দুইঃ তুমি এর থেকে ভীষণ ভয়ের কারণও বুঝতে পারলে। কেননা যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, মানুষ তার মুখ থেকে একটা কুফরী কথা বের করে, সে উক্ত কথাটি অজ্ঞতা বশতঃ বলে ফেলে তবু তার কোন ওযর আপত্তি খাটে না।

এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি মুশরিকদের আকীদার অনুরূপ আকীদা পোষণ করে আর বলে থাকে যে, অমুক কথা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে তখন তার অবস্থা কি হতে পারে ?

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে, কুরআনে বর্ণিত হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনাটি যে ঘটনায় মুসার কওম সৎ ও জ্ঞানী গুণী হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলঃ

“আমাদের জন্যও একটা উপাস্য মূর্তি বানিয়ে দাও যেমন তাদের জন্য রয়েছে বহু উপাস্য-মূর্তি।”
(সূরা আ’রাফ ৭: ১৩৮)

অতএব, উপরে বর্ণিত ঘটনাটি অনুরূপ বিষয় হতে শুদ্ধি লাভে তোমাকে অধিকতর প্রলুব্ধ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ
জ্বিন ও ইনসানের শত্রুতা নবী ও ওলীদের সাথে

[আলোচ্য বিষয়ঃ আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে মানুষ এবং জ্বিনদের মধ্য হতে অনেক দুশমন থাকার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল রয়েছে আল্লাহর হিকমত]

জেনে রাখ যে, পাক পবিত্র আল্লাহ তা’আলার অন্যতম হিকমত এই যে, তিনি এই তাওহীদের নিশানবরদার (প্রচারক) রূপে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাঁর পিছনে দুশমন দাঁড় করিয়ে দেন নাই।

দেখ! আল্লাহ তাঁর পাক কালামে বলছেনঃ

“এবং এই রূপে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু (সৃষ্টি) করেছি মানব ও জ্বিন সমাজের শয়তানদেরকে, এরা একে অন্যকে প্ররোচনা যুগিয়ে থাকে কতকগুলো ‘গিলটি’ করা বচনের দ্বারা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে।”
(সূরা আন’আম ৬: ১১২)

আবার কখনও তাওহীদের শত্রুদের নিকটে থাকে অনেক বিদ্যা, বহু কিতাব ও বহু যুক্তি প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

“অবস্থা এই যে, যখন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাদের কাছে, তখন তারা নিজেদের (পৈতৃক) বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়েই উৎফুল্ল হয়ে রইল।” (সূরা মু’মিন ৪০: ৮৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়
কিতাব ও সুন্নাহর অস্ত্রসজ্জা

[আলোচ্য বিষয়ঃ শত্রুপক্ষের সৃষ্ট সন্দেহাদি খন্ডনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর অস্ত্রসজ্জায় তাওহীদবাদীকে অবশ্যই সজ্জিত থাকতে হবে।]

যখন তুমি জানতে পারলে যে, নবী ও ওলীদের পিছনে দুশমন দল নিয়োজিত রয়েছে আর এ কথাও জানতে পারলে যে, আল্লাহর পথের মোড়ে উপবিষ্ট দুশমনগণ হয়ে থাকে কথা শিল্পী, বিদ্যাধর এবং যুক্তিবাগীশ, তখন তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহর দ্বীন থেকে সেই সব বিষয় শিক্ষা করা যা তোমার জন্য হয়ে উঠবে এমন এক কার্যকর অস্ত্র যে অস্ত্র দ্বারা তুমি ঐ শয়তানদের সঙ্গে মুকাবেলা এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে।

ঐ শয়তানদের পূর্বসুরী ও অগ্রদূত তাদের তোমার মহান ও মহীয়ান রব পরওয়ারদেগারকে বলেছিলঃ

> "নিশ্চয় আমি তোমার সরল সুদৃঢ় পথের উপর গিয়ে বসব, অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক হতে, তাদের ডান দিক হতে ও তাদের বামের দিক হতে; আর তাদের অধিকাংশকে তুমি কৃতজ্ঞ পাবে না।" (সূরা আ'রাফ ৭: ১৬-১৭)

কিন্তু যখন তুমি আল্লাহর পানে অগ্রসর হবে ও আল্লাহর দলীল প্রমাণাদির প্রতি তোমার হৃদয়-মন ও চোখ-কানকে ঝুকিয়ে দেবে, তখন তুমি হয়ে উঠবে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। কারণ তখন তুমি তোমার জ্ঞান ও যুক্তি প্রমাণের মুকাবেলায় শয়তানকে দূর্বল দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেনঃ

> "নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত ও কূট-কৌশল হচ্ছে অতি দুর্বল।" (সূরা নিসা ৪: ৭৬)

একজন সাধারণ মুওয়াহহিদ ব্যক্তি হাজার মুশরিক পন্ডিতের উপর জয় লাভের সামর্থ রাখে। কুরআন বজ্রগভীর ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

> "আর আমাদের যে দল, নিশ্চয় বিজয়ী হবে তারাই।" (সূরা সাফ্ফাত ৩৭: ১৭৩)

আল্লাহর দল যুক্তি ও কথার বলে জয়ী হয়ে থাকেন, যেমন তারা জয়ী হয়ে থাকেন তলোয়ার ও অস্ত্র বলে। ভয় ঐসব মুওয়াহহিদদের জন্য যাঁরা বিনা অস্ত্রে পথ চলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক কিতাব দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন যার ভিতর তিনি প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে কিতাবটি হচ্ছে 'স্পষ্ট ব্যাখ্যা যা পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।'
ফলে বাতিল পন্থিগণ যে কোন দলীল নিয়েই আসুক না কেন তার খন্ডন এবং তার অসারতা প্রতিপাদন করার মত যুক্তি প্রমাণ খোদ কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

> "আর যে কোন প্রশ্নই তারা তোমার নিকট নিয়ে আসে (যে সম্বন্ধে ওহীর মাধ্যমে) আমি সত্য ব্যাপারে এবং (তার) সুসঙ্গত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তোমাকে জানিয়ে দেই।" (সূরা ফুরকান ২৫: ৩৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় মুফাসসির বলেছেনঃ

> "কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলপন্থীরা যে যুক্তিই উপস্থাপিত করুক, এই আয়াত সামগ্রিক ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কুরআন পাক তা খন্ডনের শক্তি রাখে।"

সপ্তম অধ্যায়ঃ

বাতিল পন্থীদের দাবীসমূহের খন্ডন

(সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিতভাবে)

আমাদের সমসাময়িক যুগের মুশরিকগণ আমাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে আমি তার প্রত্যেকটির জওয়াবে সেই সব কথাই বলব যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

বাতিলপন্থীদের কথার জবাব আমরা দুই পদ্ধতিতে প্রদান করবঃ
(১) সংক্ষিপ্তকারে, (২) তাদের দাবী সমূহ বিশ্লেষণ করে বিশদ ভাবে।

(১) সংক্ষিপ্ত জওয়াব

আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এটা হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণবহ সেই সব ব্যক্তির জন্য যাদের প্রকৃত বোধ-শক্তি আছে। আল্লাহ কুরআন পাকে এরশাদ করেনঃ

> "সেই তো তিনি তোমার প্রতি যিনি নাযিল করেছেন এই কিতাব যার কতক আয়াত হচ্ছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলি হচ্ছে কিতাবের মূল এবং আর কতকগুলি হচ্ছে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট),
> ফলে যাদের অন্তরে আছে বক্রতা তারা অনুসরণ করে থাকে তার মধ্য হতে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর, ফিৎনা সৃষ্টির মতলবে এবং (অসঙ্গত) তাৎপর্য বাহির করার উদ্দেশ্যে অথচ উহার প্রকৃত তাৎপর্য কেহই জানে না আল্লাহ ব্যতীত।" (সূরা আলি ইমরান ৩: ৭)

নবী করীম (ﷺ) হতেও এটা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

> "যখন তুমি ঐ সমস্ত লোকদের দেখবে যারা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট আয়াতগুলির অনুসরণ করছে তখন বুঝে নেবে এরা সেই সব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, ঐসব লোকদের ব্যাপারে তোমরা হুশিয়ার থাক।" (বুখারী ও মুসলিম)

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে মুশরিকদের মধ্যে কতক লোক বলে থাকেঃ

> "মনে রেখ! যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা কখনো শঙ্কাগ্রস্থও হবে।" (সূরা ইউসুফঃ ৬২)

তারা আরও বলেঃ নিশ্চয় সুপারিশের ব্যাপারটি অবশ্যই সত্য; অথবা বলেঃ আল্লাহর নিকটে নবীদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

কিংবা নবী করীম (ﷺ)-এর এমন কিছু কথার তারা উল্লেখ করবে যা থেকে তারা তাদের বাতিল বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করতে চাইবে, অথচ তুমি বুঝতেই পারবে না যে, যে কথার তারা অবতারণা করছে তার অর্থ কি ?

এরূপ ক্ষেত্রে তার জবাব এই ভাবে দিবেঃ

আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেনঃ "যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুহ্‌কাম (সুস্পষ্ট) আয়াতগুলো বর্জন করে থাকে আর মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের পিছনে ধাবিত হয়।"

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

> 'মুশরিকগণ আল্লাহর রুবুবিয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তবু আল্লাহ তাদেরকে কাফেররূপে অভিহিত করেছেন এজন্যই যে, তারা ফেরেশতা, নবী ও ওলীদের সঙ্গে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে বলে থাকেঃ "এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস ১০: ১৮)

এটি একটি মুহকাম আয়াত যার অর্থ পরিষ্কার। এর অর্থ বিকৃত করার সাধ্য কারোরই নেই।

আর হে মুশরিক! তুমি কুরআন অথবা নবী (ﷺ) এর বাণী থেকে যা আমার নিকট পেশ করলে তার অর্থ আমি বুঝি না, তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহর কালামের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধী কথা নেই, আর আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর কোন কথাও আল্লাহর কালামের বিরোধী হতে পারে না।

এই জবাবটি অতি উত্তম ও সর্বতোভাবে সঠিক। কিন্তু আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন সে ছাড়া আর কেউ একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এই জওয়াবটি তুমি তুচ্ছ মনে করোনা, দেখ আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করেনঃ

> "বস্তুতঃ যারা ধৈর্য্য ধারণে অভ্যস্ত তারা ব্যতীত আর কেউই এই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না, অধিকন্তু মহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেউই এই আদর্শ জীবন লাভে সমর্থ হয় না।" (সূরা আস সিজদা ৩২: ৩৫)

(২) বিস্তারিত জওয়াব

সত্য দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে হটিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর দুশমনগণ নবী রাসূলদের (আলায়হিমুস সালাম) প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব ওযর আপত্তি ও বক্তব্য পেশ করে থাকে তার মধ্যে একটি এইঃ

তারা বলে থাকেঃ

"আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করিনা বরং আমরা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, কেউই সৃষ্টি করতে, রিযিক দিতে, উপকার এবং অপকার সাধন করতে পারে না একমাত্র একক এবং লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া-আর (আমরা এ সাক্ষ্যও দিয়ে থাকি যে,) স্বয়ং মুহাম্মদ (ﷺ)-ও নিজের কোন কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নন।

আবদুল কাদের জিলানী ও অন্যান্যরা তো বহু দূরের কথা। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, আর যারা আল্লাহর সালেহ বান্দা তাদের রয়েছে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা, তাই তাঁদের মধ্যস্থতায় আমি আল্লাহর নিকট তাঁর করুণা প্রার্থী হয়ে থাকি।"

<u>এর উত্তর পূর্বেই দেয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে এইঃ</u>

যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধ করেছেন তারাও তুমি যে কথার উল্লেখ করলে তা স্বীকার করত, আর এ কথাও তারা স্বীকার করত যে, প্রতিমাগুলো কোন কিছুই পরিচলনা করে না। তারা প্রতিমাগুলোর নিকট পার্থিব মর্যাদা ও আখেরাতের মর্যাদার দিকে শাফা'আত কামনা করত।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন সে সব তাদের পড়ে শুনিয়ে দাও। এখানে সন্দেহকারী যদি (এই কুট তর্কের অবতারণা করে আর) বলে যে,

এই যে আয়াত মূর্তি-পূজকদের সম্বন্ধে অবতীর্ন হয়েছে, তবে তোমরা কিভাবে সৎ ব্যক্তিদেরকে ঠাকুর বিগ্রহের সমতুল্য করে নিচ্ছ অথবা নবীগণকে কিভাবে ঠাকুর বিগ্রহের শামিল করছ?

এর জবাব ঠিক আগের মতই। কেননা, যখন সে স্বীকার করছে যে, কাফেরগণও আল্লাহর সার্বভৌম রুবুবিয়াতের সাক্ষ্য দান করে থাকে আর তারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে নযর নিয়ায প্রভৃতি পেশ অথবা পূজা অর্চনা করে থাকে তাদের থেকে মাত্র সুপারিশই কামনা করে;

কিন্তু যখন তারা আল্লাহ এবং তাদের কার্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করছে, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা হলে তাকে বলে দাওঃ কাফেরগণের মধ্যে কতক তো প্রতিমা পূজা করে, আবার কতক ঐসব আওলিয়াদের আহ্বান করে যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেনঃ

> "যাদেরকে তারা আহ্বান করে থাকে তারা তো নিজেরাই তাঁর নৈকট্য লাভের অবলম্বন খুঁজে বেড়ায় যে, তাদেও মধ্যে কে নিকটতর। এবং তারা সকলে তাঁর রহমত লাভের আকাঙ্খা করে থাকে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে চলে, নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।" (সূরা ইসরা ১৭: ৫৭)

এবং অন্যরা মরিয়ম তনয় ঈসা ও তাঁর মাকে আহ্বান করে অথচ মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

> "মরিয়ম তনয় মসীহ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে, আর মসীহের মাতা ছিল একজন সতিসাদ্ধ নারী; তাঁরা উভয়ে (ক্ষুধার সময়) অন্ন ভক্ষণ করত।
> লক্ষ্য কর, কি রূপে আমরা তাদের জন্য প্রমাণগুলিকে বিশদ রূপে বর্ণনা করে দিচ্ছি, অতঃপর আরও দেখ তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে কোন্ দিকে। জিজ্ঞাসা করঃ তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করতে থাকবে যারা তোমাদের অনিষ্ট বা ইষ্ট করার কোনও ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ, একমাত্র তিনিই তো হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্ববিদিত।" (সূরা মায়েদা ৫: ৭৫-৭৬)

উল্লিখিত হঠকারীদের নিকটে আল্লাহ তা'আলার একথাও উল্লেখ করঃ

> "এবং (স্মরণ কর সেই দিনের কথা) যে দিন আল্লাহ একত্রে সমবেত করবেন তাদের সকলকে, তৎপর ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ এরা কি বন্দেগী করত তোমাদের? তারা বলবেঃ পবিত্রতায় সুমহান তুমি! তুমিই তো আমাদের রক্ষক অভিভাবক, তারা নহে, কখনই না, বরং অবস্থা ছিল এই যে, এরা পূজা করত জ্বিনদেরকে, এদের অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাসী।" (সূরা সাবা ৩৪: ৪০-৪১)

আরও উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

"এবং আল্লাহ যখন বলবেন, হে মরিয়মের পুত্র ঈসা। তুমিই কি লোকদেরকে বলেছিলেঃ তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ছাড়াও আর দু'টি রবরূপে গ্রহণ করবে? ঈসা বলবে, মহিমাময় তুমি!

যা বলার অধিকার আমার নেই আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব হতে পারে না, আমি ঐ কথা বলে থাকলে তুমি তা নিশ্চয় অবগত আছ, আমার অন্তরের বিষয় তুমি বিদিত আছ কিন্তু তোমার অন্তরের বিষয় আমি অবগত নই, নিশ্চয় তুমি একমাত্র, তুমিই তো হচ্ছ সকল অদৃষ্ট বিষয়ের সম্যক পরিজ্ঞাতা।" (সূরা মায়েদাহ ৫: ১১৬)

তারপর তাকে বলঃ তুমি কি (এখন) বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ প্রতিমা-পূজকদের যেমন কাফের বলেছেন, তেমনি যারা নেক লোকদের শরণাপন্ন হয় তাদেরকেও কাফের বলেছেন, এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সঙ্গে জিহাদও করেছেন।

যদি সে বলেঃ

কাফেরগণ (আল্লাহ ছাড়া) তাদের নিকট কামনা করে থাকে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক ও সৃষ্টির পরিচালক, আমি তো তাকে ছাড়া অন্য কারোর নিকট কিছুই কামনা করি না।

আর নেককার-মুরুব্বীদের এসব বিষয়ে কিছুই করার নেই, তবে তাদের শরণাপন্ন হই এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করবে।

এর জবাব হচ্ছে এ তো কাফেরদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি মাত্র, তুমি তাকে আল্লাহর এই কালাম শুনিয়ে দাওঃ

"আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে যারা (তারা বলে), আমরা তো ওদের পূজা করিনা, তবে (তাদের শরণাপন্ন হই) যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" (সূরা যুমার ৩৯: ৩)

আল্লাহর এ কালামও শুনিয়ে দাওঃ

"তারা (মুশরিকগণ) বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুস ১০: ১৮)

অষ্টম অধ্যায়
দু’আ ইবাদতের সারাংশ
[যারা মনে করে যে, দু’আ ইবাদত নয় তাদের প্রতিবাদ]

তুমি জেনে রাখো যে, এই যে তিনটি সন্দেহ সংশয়ের কথা বলা হ’ল এগুলো তাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য এ সব বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তা তুমি উত্তমরূপে বুঝে নিয়েছ, তখন এগুলো সহজবোধ্য হয়ে গেল তোমার নিকট, অতএব এর পর অন্য সব সংশয় সন্দেহের অপনোদন মোটেই কঠিন হবে না।q

যদি সে বলে,
আমি আল্লাহ ছাড়া কারোর উপাসনা করিনা আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নিকট ইলতেজা (বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা) এবং তাঁদের নিকট দু’আ করা তাঁদের ইবাদত নয়।

তবে তুমি তাকে বলঃ তুমি কি স্বীকার কর যে, আল্লাহর ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস বা বিশুদ্ধ করা তোমার উপর ফরয করেছেন আর এটা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক?

যখন সে বলবে হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি, তখন তাকে বলঃ
এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও, কি সেই ইবাদত যা একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করা তোমার উপর তিনি ফরয করেছেন এবং তা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক।

ইবাদত কাকে বলে এবং তা কত প্রকার তা যদি সে না জানে তবে এ সম্পর্কে তার নিকটে আল্লাহর এই বাণী বর্ণনা করে দাওঃ

> “তোমরা ডাকবে নিজেদের রবকে বিনীতভাবে ও সংগোপনে, নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।” (সূরা আ’রাফ ৭: ৫৫)

এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাস করঃ দু’আ করা যে ইবাদত সেটা কি এখন বুঝলে?
সে অবশ্যই বলবেঃ হ্যাঁ, কেননা হাদীসেই তো আছেঃ “দু’আ ইবাদতের সারবস্তু” !

তখন তুমি তাকে বলঃ যখন তুমি স্বীকার করে নিলে যে দু’আটা হচ্ছে ইবাদত, আর তুমি আল্লাহকে দিবানিশি ডাকছ যখন তুমি কোন নবীকে অথবা অন্য কাউকে ডাকছ ঐ একই প্রয়োজন মিটানোর জন্য, তখন কি তুমি আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করছ না?
সে তখন অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, হ্যাঁ, শরীক করছি বটে।
তখন তাকে শুনিয়ে দাও আল্লাহর এই বাণীঃ

> “অতএব তুমি নামাজ পড়বে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে এবং (সেইভাবেই) কুরবানী করবে।”
> (সূরা কাওসার ১০৮: ২)

এর উপর আমল করে তার জন্য তুমি যখন কুরবানী করছ তখন সেটা কি ইবাদত নয়?
এর জবাবে সে অবশ্য বলবেঃ হ্যাঁ, ইবাদতই বটে।

এবার তাকে বলঃ

তুমি যদি কোন সৃষ্টির জন্য যেমন নবী, জ্বিন বা অন্য কিছুর জন্য কুরবানী কর তবে কি তুমি এই ইবাদতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করলে না?

সে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং বলবেঃ হ্যাঁ।

তাকে তুমি একথাও বলঃ

যে মুশরিকদের সম্বন্ধে কুরআন (এর নির্দিষ্ট আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে তারা কি ফেরেশতা, (অতীতের) নেক লোক ও লাত উয্যা প্রভৃতির ইবাদত করত?

সে অবশ্যই বলবেঃ হ্যাঁ, করত।

তারপর তাকে বলঃ

তাদের ইবাদত বলতে তো তাদের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন, পশু যবহ করণ ও আবেদন নিবেদন ইত্যাদিই বুঝাতো বরং তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহরই বান্দা ও তাঁরই প্রতাপাধীন বলে স্বীকৃতি দিত।

আর একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহই সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের পরিচালক। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের যে মর্যাদা রয়েছে সে জন্যই তারা তাদের আহ্বান করত বা তাদের নিকট আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করত সুপারিশের উদ্দেশ্যে।

এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

নবম অধ্যায়
শরী'আত সম্মত শাফা'আত এবং শিরকী শাফা'আতের মধ্যে পার্থক্য

যদি সে বলে তুমি কি নবী করীম (ﷺ)-এর শাফা'আত কে অস্বীকার করছ ও তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত মনে করছ? তুমি তাঁকে উত্তরে বলবেঃ না, অস্বীকার করি না। তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্তও মনে করিনা।

বরং তিনিই তো সুপারিশকারী যার শাফা'আত কবুল করা হবে। আমিও তাঁর শাফা'আতের আকাঙ্খী। কিন্তু শাফা'আতের যাবতীয় চাবি-কাঠি আল্লাহরই হাতে, যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

> "বলঃ সকল প্রকারের সমস্ত শাফা'আতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।" (সূরা যুমার ৩৯: ৪৪)

যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

> "তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে কে আছে এমন (শক্তিমান) ব্যক্তি? (সূরা আল-বাকারা ২: ২৫৫)

এবং কারো সম্বন্ধেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুপারিশ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্বন্ধে আল্লাহ সুপারিশের অনুমতি দিবেন।
যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

> "আর আল্লাহ মর্জী করেন যার সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য তাঁরা সুপারিশ করবেনা।" (সূরা আম্বিয়া ২১: ২৮)

আর (একথা মনে রাখা কর্তব্য যে), আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ অর্থাৎ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম ছাড়া কিছুতেই রাজী হবেন না। যেমন তিনি বলেছেনঃ

> "বস্তুতঃ ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোনও দ্বীনের উদ্দেশ্য করবে যে ব্যক্তি, তার পক্ষ হতে আল্লাহর কাছে তা গৃহীত হবে না।" (সূরা আলি ইমরান ৩: ৮৫)

বস্তুতঃপক্ষে যখন সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর অধিকারভুক্ত এবং তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ, আর নবী করীম (ﷺ) বা অন্য কেহ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন না, আর আল্লাহর অনুমতি একমাত্র মুওয়াহহিদদের জন্যই নির্দিষ্ট, তখন তোমার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সকল প্রকারের সমস্ত শাফা'আতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

সুতরাং তুমি সুপারিশ তাঁরই নিকট কামনা কর এবং বলঃ "হে আল্লাহ! আমাকে রাসূল (ﷺ)-এর সুপারিশ হতে মাহরুম করোনা। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে আমার জন্য সুপারিশকারী করে দাও।

অনুরূপভাবে অন্যান্য দু'আও আল্লাহর নিকটেই করতে হবে। যদি সে বলে, নবী করীম (ﷺ)-কে শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে কাজেই আমি তাঁর নিকটেই বস্তু চাচ্ছি যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেনঃ
তার উত্তর হচ্ছেঃ **আল্লাহ তাঁকে শাফা'আত করার অধিকার প্রদান করেছেন এবং তিনি তোমাকে তাঁর নিকটে শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন।**

আল্লাহ বলেছেনঃ

“অতএব (তোমরা আহ্বান করতে থাকবে একমাত্র আল্লাহকে এবং) আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না।” (সূরা জ্বিন ৭২: ১৮)

যখন তুমি আল্লাহকে এই বলে ডাকবে যে, তিনি যেন তাঁর নবী-কে তোমার জন্য সুপারিশকারী করে দেন, তখন তুমি আল্লাহর এই নিষেধ বাণী পালন করলেঃ

“আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবেনা।” (সূরা জ্বিন ৭২: ১৮)

আরও একটি কথা হচ্ছে যে, সুপারিশের অধিকার নবী ব্যতীত অন্যদেরও দেয়া হয়েছে। যেমন, ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন, ওলীগণও সুপারিশ করবেন। মাসুম বাচ্চারাও (তাদের পিতামাতাদের জন্য) সুপারিশ করবেন।

কাজেই তুমি কি সেই অবস্থায় বলতে পারো যে, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, কাজেই তাদের কাছেও তোমরা শাফা'আত চাইবে? যদি তা চাও তবে তুমি নেক ব্যক্তিদের উপাসনায় শামিল হলে।

যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে (হারাম বা অবৈধ বলে) উল্লেখ করেছেন।

তুমি যদি বলঃ না, তাদের কাছে সুপারিশ চাওয়া যাবে না, তবে সেই অবস্থায় তোমার এই কথা (নিম্নোল্লিখিত) স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে যে,

আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার প্রদান করেছেন এবং আমি তার নিকট সেই বস্তুই চাচ্ছি যা তিনি তাকে দান করেছেন।

দশম অধ্যায়
এ কথা সাব্যস্ত করা যে, নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা অথবা নিবেদন পেশ করা শিরক
এবং যারা একথা অস্বীকার করে তাদেরকে স্বীকৃতির দিকে আকৃষ্ট করা।

যদি সে বলেঃ *আমি আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকেই শরীক করিনা- কিছুতেই নয়, কক্ষণও নয়। তবে নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করে থাকি, আর এটা শিরক নয়।*

এর জবাবে তাকে বলোঃ যখন তুমি স্বীকার করে নিয়েছ যে, ব্যভিচার হারাম বলে নির্দেশিত করেছেন আর এ কথাও মেনে নিয়েছ যে, আল্লাহ তা'আলা এই মহা পাপ ক্ষমা করেনা, তাহলে ভেবে দেখ সেটা কিরূপ ভয়ঙ্কর বস্তু যা তিনি হারাম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, তিনি উহা মাফ করবেন না।

কিন্তু এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না- সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাকে তুমি বলঃ তুমি কিভাবে শিরক থেকে আত্মরক্ষা করবে যখন তুমি একথা জানলে না যে, শিরক কি জঘন্য পাপ অথবা একথাও জানলে না যে, কেন আল্লাহ তোমার উপর শিরক হারাম করেছেন আর বলে দিয়েছেন যেঃ তিনি ঐ পাপ মাফ করবেন না।
আর তুমি এ বিষয়ে কিছুই জাননা অথচ তুমি এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাও করছ না। তুমি কি ধারণা করে বসে আছ যে, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন আর তিনি তার (কারণগুলি) বিশ্লেষণ করেননি?

যদি সে বলেঃ শিরক হচ্ছে মূর্তিপূজা আর আমরা তো মূর্তি পূজা করছি না, তবে তাকে বলঃ মূর্তি পূজা কাকে বলে? তুমি কি মনে কর যে, মুশরিকগণ এই বিশ্বাস পোষণ করে যে এসব কাঠ ও পাথর (নির্মিত মূর্তিগুলো) সৃষ্টি ও রিযিক দান করতে সক্ষম এবং যারা তাদেরকে আহ্বান করে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের কাজের সুব্যবস্থা করে দিতেও সামর্থ রাখে? একথা তো কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে।

যদি সে বলে, শিরক হচ্ছে যারা কাঠ ও পাথর নির্মিত মূর্তি বা কবরের উপর কুব্বা ইত্যাতিকে লক্ষ্য করে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এদের প্রতি আহ্বান জানায়, এদের উদ্দেশ্যে বলীদান করবে আর এদের বরকতে আল্লাহ আমাদের বিপদ-আপদ দূর করবেন বা আল্লাহ এদের বরকতে অনুগ্রহ করবেন।

তবে তাকে বলঃ হ্যাঁ, তুমি সত্য কথাই বলেছ আর এটাই তো তোমাদের কর্ম কান্ড যা পাথর, কবরের কুব্বা প্রভৃতির নিকটে করে থাক। ফলতঃ সে স্বীকার করছে যে, তাদের এই কাজগুলো হচ্ছে মূর্তি পূজা, আর এটাই তো আমরা চাই। অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই তোমাদের কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকারান্তরে মেনে নিলে।

এই এক বিষয়ের গোপন রহস্য হচ্ছেঃ যখন সে বলবে, আমি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করি না, তখন তুমি তাকে বলঃ আল্লাহর সঙ্গে শির্কের অর্থ কি? তুমি তার ব্যাখ্যা দাও। যদি সে এর ব্যাখ্যায় বলেঃ তা হচ্ছে মূর্তি পূজা, তখন তুমি তাকে আবার প্রশ্ন করঃ মূর্তি পূজার মানে কি? তুমি আমাকে তার ব্যাখ্যা প্রদান কর।

যদি সে উত্তরে বলেঃ আমি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না, তখন তাকে আবার প্রশ্ন করঃ এককভাবে আল্লাহর ইবাদতেরই বা অর্থ কি? এর ব্যাখ্যা দাও।

উত্তরে যদি সে কুরআন যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেই ব্যাখ্যাই দেয় তবে তো আমাদের দাবীই সাব্যস্ত হল আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর যদি সে কুরআনের সেই ব্যাখ্যাটা না জানে, তবে সে কেমন করে এমন বস্তুর দাবী করেছে যা সে জানে না? আর যদি সে তার এমন ব্যাখ্যা করছে যা সে জানে না?

আর যদি সে তার এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা তার প্রকৃত অর্থ নয়, অথচ তুমি তো তার নিকটে আল্লাহর সঙ্গে শিরক এবং মূর্তি পূজা আর ঐ কাজটিই তো হুবহু করে চলেছে এ যুগের মুশরিকগণ!

আর শরীক বিহীন একক যে আল্লাহর ইবাদত, তাই তারা আমাদের কাছে ইনকার করে আসছে আর এ নিয়ে তাদের পূর্বসুরীদের ন্যায় তারা শোরগোল করছে। তার পূর্বসরীরা বলতোঃ

> "এই লোকটা কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ-তে পরিণত করছে? এটা তো বস্তুতঃই একটা তাজ্জব ব্যাপার।" (সূরা সা'দ ৩৮: ৫)

সে যদি বলে ফেরেশতা ও আম্বিয়াদের ডাকার কারণে তাদেরকে তো কাফের বলা হয়নি। ফেরেশতাদেরকে যারা আল্লাহর কন্যা বলেছিল তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। আমরা তো আবদুল কাদের বা অন্যদেরকে বা অন্যদেরকে আল্লাহর পুত্র বলি না।

তার উত্তর হচ্ছে এই যে, সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করাটাই স্বয়ং কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

> "বলঃ তিনিই একক আল্লাহ (তিনি ব্যতীত আল্লাহ আর কেউ নেই)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ।"
> (সূরা ইখলাস ১১২: ১-২)

"আহাদ" এর অর্থ হল একক এবং তার সমতুল্য কেউই নেই। আর "সামাদ" এর অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনে একমাত্র যার স্মরণ নেয়া হয়। অতএব, যে এটাকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায়Ñযদিও সে সূরাটাকে অস্বীকার করে না।
আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ
"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেনা, আর তাঁর সঙ্গে অপর কোন ইলাহ, (উপাস্য) নেই।"

উপরে কুফরীর যে দুটি প্রকরণের উল্লেখ করা হয়েছে তা আল্লাহ পৃথকভাবে উল্লেখ করলেও উভয়ই নিশ্চিত রূপে কুফর। আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ

> "আর এই (অজ্ঞ) লোকগুলো জ্বিনকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে অথচ ঐগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য তারা কতকগুলো পুত্রকন্যাও উদ্ভাবন করে নিয়েছে কোন জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া।" (সূরা আন'আম ৬: ১০০)

এখানেও দুই প্রকারের কুফরীকে তিনি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ এটাও পারে যে, নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল লাতকে আহ্বান করে যদিও লাত ছিল একজন সৎ লোক। তারা তাকে আল্লাহর ছেলেও বলেনি।

অপর পক্ষে যারা জ্বিনদের পূজা করে কাফের হয়েছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর ছেলে বলেনি। এই রকম **“মুরতাদ” (**যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যায়) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চার মাযহাবের বিদ্বানগণ বলেছেন যে, মুসলমান যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহর ছেলে রয়েছে তবে সে **“মুরতাদ”** হয়ে গেল।

তারাও উক্ত দুই প্রকারের কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এটা তো খুবই স্পষ্ট। যদি সে আল্লাহর এই কালাম পেশ করেঃ

> **“**দেখঃ আল্লাহর ওলী যারা, কোন আশঙ্কা নেই তাদের এবং কখনও শঙ্কাগ্রস্থ হবে না তারা।**”**
> **(**সূরা ইউনুস **১০:** ৬২)

তবে তুমি বলঃ হ্যাঁ, একথা তো অভ্রান্ত সত্য কিন্তু তাই বলে তাদের পূজা করা চলবে না।
আর আমরা কেবল আল্লাহর সঙ্গে অপর কারোর পূজা এবং তার সঙ্গে শির্কের কথাই অস্বীকার করছি। নচেৎ আওলিয়াদের প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের কারামতগুলোকে স্বীকার করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আওলিয়াদের কারামতকে বিদ’আতী ও বাতেলপন্থীগণ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

আল্লাহর দ্বীন দুই প্রান্তসীমা ইফরাত ও তাফরীতের মধ্যস্থলে, আল্লাহর পথ দুই বিপরীতমূখী ভ্রষ্টতার মাঝখানে এবং আল্লাহর হক দুই বাতিলের মধ্যপথে অবস্থিত।

একাদশ অধ্যায়

আমাদের যুগের লোকদের শিরক অপেক্ষা পূর্ববর্তী লোকদের শিরক ছিল অপেক্ষকৃত হালকা

তুমি যখন বুঝতে পারলে যে, যে বিষয়টিকে আমাদের যুগের মুশরিকগণ নাম দিয়েছেন 'ইতেকাদ'-(ভক্তি মিশ্রিত বিশ্বাস) সেটাই হচ্ছে সেই শিরক যার বিরুদ্ধে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল যার কারণে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ন হয়েছেন।

তখন তুমি জেনে রাখ যে, পূর্ববর্তী লোকদের শিরক ছিল বর্তমান যুগের লোকদের শিরক অপেক্ষা অধিকতর হালকা বা লঘুতর। আর তার কারণ হচ্ছে দুটিঃ

(এক) পূর্ববর্তী লোকগণ কেবল সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহর সঙ্গে অপরকে শরীক করতো এবং ফেরেশতা আওলিয়া ও ঠাকুর-দেবতাদেরকে আহ্বান জানাতো, কিন্তু বিপদ আপদের সময় একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতো, সে ডাক হত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল।

যেমন আল্লাহ তাঁর পাক কুরআনে বলেছেনঃ

> "সাগর বক্ষে যখন কোন বিপদ তোমাদেরকে স্পর্শ করে, আল্লাহ ব্যতীত আর যাহাদিগকে ডেকে থাক তোমরা, তারা সকলেই তো তখন (মন হতে দূরে) সরে যায়, কিন্তু আল্লাহ যখন তোমাদেরকে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে উদ্ধার করেন তখন তোমরা অন্যদিকে ফিরে যাও; নিশ্চয় মানুষ হচ্ছে অতিশয় না শুকরগুযার।" (সূরা বানী ইসরাইল ১৭: ৬৭)

আল্লাহ এ কথাও বলেছেনঃ

> "বলঃ তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোন আযাব যদি আপতিত হয় অথবা কিয়ামত দিবস যদি এসে পড়ে তখন কি তোমরা আহ্বান করবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে? (উত্তর দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
>
> কখনই না, বরং তোমরা আহ্বান করবে তাঁকেই, যে আপদের কারণে তাঁকে আহ্বান করছ, ইচ্ছা করলে তিনি সেই আপদগুলো দূর করে দিবেন। আহ্বানের কারণ স্বরূপ আপদগুলো মোচন করে দিবেন, আর তোমরা যা কিছুকে আল্লাহর শরীক করছ তাহাদিগকে তোমরা তখন ভুলে যাবে।" (সূরা আন'আম ৬: ৪০-৪১)

আল্লাহ তা'আলা একথাও বলেছেনঃ

> "যখন কোন দুঃখ কষ্ট আপতিত হয় মানুষের উপর তখন সে নিজে পরওয়াদিগারকে ডাকতে থাকে একনিষ্ঠভাবে, অতঃপর যখন তিনি তাকে কোন নে'য়ামতের দ্বারা অনুগৃহীত করেন, তখন সে ভুলে যায় সেই বস্তুকে যার জন্য সে পূর্বে প্রার্থনা করেছিল এবং আল্লাহর বহু সদৃশ্য ও শরীক বানিয়ে নেয় তাঁর পথ হতে (লোকদিগকে) ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে।
>
> বলঃ কিছুকাল তুমি নিজের কুফর জনিত সুখ-সুবিধা ভোগ করলেও, নিশ্চয় তুমি তো হচ্ছ জাহান্নামের অধিবাসীদের একজন।" (সূরা যুমার ৩৯: ৮)

অতঃপর আল্লাহর এই বাণীঃ

> "যখন পর্বতের ন্যায় তরঙ্গমালা তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে, তখন তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে।" (সূরা লোকমান ৩১: ৩২)

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হল যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যার সারংসার হচ্ছে এই যে মুশরিদের বিরুদ্ধে রাসূল (ﷺ) যুদ্ধ করেছিলেন তারা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সময়ে আল্লাহকেও ডাকতো আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যকেও ডাকতো,
কিন্তু বিপদ-বিপর্যয়ের সময় তারা একক ও লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকতো না, তারা বরং সে সময় অন্য সব মাননীয় ব্যক্তি ও পূজা সত্তাদের ভুলে বরং সে সময় অন্য সব মাননীয় ব্যক্তি ও পূজা সত্তাদের ভুলে যেতো, সেই ব্যক্তির নিকট পূর্ব যামানার লোকদের শিরক এবং আমাদের বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে যার হৃদয় এই বিষয়টি উত্তমরূপে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করবে? একমাত্র আল্লাহই আমাদের সহায়।

(দুই) পূর্ব যামানার লোকগণ আল্লাহর সঙ্গে এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করতো যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্ত, তারা হতেন হয় নবী-রাসূলগণ, নয় ওলী-আওলিয়া নতুবা ফেরেশতাগণ!
এছাড়া তারা হয়তো পূজা করতো এমন বৃক্ষ অথবা পাথরের যারা আল্লাহর একান্ত বাধ্য ও হুকুমবরদার, কোন ক্রমই তারা অবাধ্য নয়, হুকুম অমান্যকারী নয়।

কিন্তু আমাদের এই যুগের লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে এমন লোকদের ডাকে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় যারা নিকৃষ্টতম অনাচারী, আর যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয় ও প্রার্থনা জানায় তারাই তাদের অনাচারগুলোর কথা ফাঁস করে দেয়, সে অনাচারগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার চুরি এবং নামায পরিত্যাগের মত গর্হিত কাজ সমূহ।

আর যারা নেক লোকদের প্রতি আস্থা রেখে তাদের পূজা করে বা এমন বস্তুর পূজা করে যেগুলো কোন পাপ করে না যেমনঃ গাছ, পাথর ইত্যাদি তারা ঐ সব লোকদের থেকে নিশ্চয় লঘুতর পাপী যারা ঐ লোকদের পূজা করে যাদের অনচার ও পাপচারগুলোকে তারা স্বয়ং দর্শন করে থাকে এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয-ওয়াজিব পালন করে, সে তাওহীদবিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না।

যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জী।

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শিরকী কাজে লিপ্ত- নামধারী মুসলমানদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শিরক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল।

অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি।

অতএব এই ভ্রান্তিও অপনোদন ও সন্দেহের অবসানকল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনোঃ
তারা বলে থাকেঃ যাদের প্রতি সাক্ষাৎ ভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিকগণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নাই, তার রাসূল (ﷺ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুররুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি যাদু মন্ত্র।
কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মাবুদ এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে,) নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর বিশ্বাস রাখি, আমরা নামায পড়ি এবং রোযাও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শরীআতের বিদ্বান মন্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না;
এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু নামায যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, নামাযও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না;
অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু রোযাকে অস্বীকার করে বসল কিংবা ঐ গুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফের।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় কতক লোক হজ্জকে ইনকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

> "(পথের কষ্ট সহ্য করতে এবং) রাহা খরচ বহনে সক্ষম যে ব্যক্তি (সেই শ্রেণীর) সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের (কা'বাতুল্লাহর) হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহ হচ্ছেন সমুদয় সৃষ্টি জগত হতে বেনেয়ায।" (সূরা আলি ইমরান ৩: ৯৭)

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, হজ্জ) মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল লুট করা সিদ্ধ হবে)।

যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

> "নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে প্রভেদ করতে চায় আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি আর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায় এই যে লোক সমাজ সত্যই তারা হচ্ছে কাফের, বস্তুতঃ কাফেরদিগের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"
> (সূরা আন নিসা ৪: ১৫০ - ১৫১)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারা এ সম্পর্কিত ভ্রান্তির অপনোদন ঘটছে।

আর এই বিষয়টি জনৈক "আহ্সা" বাসী আমার নিকট প্রেরিত তার পত্রে উল্লেখ করেছেন।

তাকে একথাও বলা যাবেঃ তুমি যখন স্বীকার করছ যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সত্য জানবে আর কেবল নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে, ঐ রূপ সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও কাফের হয়ে যাবে।

ঐরূপই সে কাফের হয়ে যাবে যদি ঐ সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে আর কেবল মাত্র রামাযানের রোযাকে ইনকার করে। এতে কোন মাযহাবেরই দ্বিমত নেই। আর কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। সুতরাং জানা গেল যে, নবী (ﷺ) যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা নামায, রোযা ও হজ্জ হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নবী (ﷺ) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজেব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি রাসূল, সমস্ত দ্বীনের মূল বস্তু তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবী (ﷺ)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও দিত এবং সালাতও আদায় করত।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামা (কায্যাব)-কে একজন নবী বলে মেনেছিল।

তবে তার উত্তরে বলবেঃ ঐটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফের হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দুটি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্যঃ আল্লাহ ছাড়া নেই অপর কোন ইলাহ, দ্বিতীয় সাক্ষ্যঃ মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না।

নামাযও তার কোন কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিমান কি হবে যে, শিমসান, ইউসুফ (অতীতে নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হত) বা কোন সাহাবা বা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাক পবিত্র তিনি, তাঁর শান-শাওকাত কত উচ্চ।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন :

"যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ এই ভাবেই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।" (সূরা রূম ৩০: ৫৯)

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবেঃ হযরত আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং হযরত আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা সাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা হযরত আলীর সম্বন্ধে ঐ রূপ বিশ্বাস রাখত যেমন ইউসুফ, শিসমান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হত।

(প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবাগণ তাদেরকে (ঐভাবে) হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন? তাহলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছি যে, সাহাবাগণ মুসলমানকে কাফেরের রূপে আখ্যায়িত করেছেন? জানি তোমরা ধারণা করছ যে, তাজ এবং অনুরূপ ভাবেই অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল হযরত আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরী?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে,

যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ বানু আব্বাসের শাসন কালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কালেমার সাক্ষ্য দিত ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুমা ও জামা'আতে নামাযও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন।

আর তাদের দেশকে দারুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলমানদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফের বলা হত তাদের এজন্যই তা বলা হত যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক ছাড়াও রাসূল (ﷺ) ও কুরআনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করত।

কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয় তাহলে "বাবু হুকমিল মুরতাদ"- মুরতাদের হুকুম নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে যা সব মাযহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন?

"মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যায়।"

তারপর তারা মুরতাদের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফের বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এমনকি তারা কতিপয় লঘু অপরাধ যেমন অন্তর হতে নয়, মুখ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা মশকরার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল। এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তাদের এ কথাও বলা যেতে পারেঃ যে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

> "তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরী কথাই বলছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।" (সূরা তওবা ৯: ৭৪)

তুমি কি শুননি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, নামায পড়েছে যাকাত দিয়েছে, হজব্রত পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে?

আর ঐসব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেনঃ

> "তুমি বলঃ তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলোর এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত পেশ কর না, তোমরা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার পরও তো কুফরী কাজে লিপ্ত ছিলে।" (সূরা তওবা ৯:৬৫-৬৬)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

অতএব, তুমি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। সেটা হলঃ তারা বলে, তোমরা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ।

কেননা এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই উপকারজনক। এই বিষয়ের আর একটা প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনী যা আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাইলের সম্বন্ধে বলেছেন।

তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহ সত্বেও তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ

> "আমাদের উপাসনার জন্য তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন।" (সূরা আ'রাফ ৭: ১৩৮)

ঐরূপ সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেনঃ

> "আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত প্রতিষ্ঠা করে দিন। তখন নবী (ﷺ) হলফ করে বললেনঃ এটা তো বানী ইসরাইলদের মত কথা যা তারা মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ আমাদের জন্যও একটা উপাস্য (দেবতা) বানিয়ে দাও তাদের মূর্তির মত।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক হতে যারা তওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি?

[মুসলমানদের মধ্যে যখন কোন এক প্রকারের শিরক অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ করে ফেলে তারপর তারা তা হতে তওবা করে, তখন তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি?]

মুশরিকদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয় যা তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে বর্ণনা করে-আর তা হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ বানী ইসরাইলরা "আমাদের জন্য উপাস্য দেবতা বানিয়ে দিন" একথা বলে তারা কাফের হয়ে যায় নি।
অনুরূপভাবে যারা বলেছিলঃ "আমাদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিন, তারাও কাফেরে পরিণত হয় নি।

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাইলেরা যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা তারা কার্য্যে পরিণত করেনি, তেমনিভাবে যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিতে বলে ছিল তারাও তা করেনি।

বানী ইসরাইল যদি তা করে ফেলতো, তবে অবশ্যই তারা কাফের হয়ে যেতো। এ বিষয়ে কারো কোন ভিন্ন মত নেই।

একই রূপে এই বিষয়েও কোন মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'যাতে আনওয়াতের' ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন তারা যদি নবী (ﷺ) এর হুকুম অমান্য করে নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাতে আনওয়াত- এর প্রতিষ্ঠা করত তা হলে তারাও কাফের হয়ে যেত, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন মুসলমান বরং আলেম কখনও কখনও শির্কের বিভিন্ন প্রকরণে লিপ্ত হয় কিন্তু সে তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে এথেকে বাঁচার জন্য শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আর জাহেলরা যে বলে আমরা তাওহীদ বুঝি, এটা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্খতা এবং তা হচ্ছে শয়তানের চক্রান্ত।

আর এটাও জানা গেল যে, মুজতাহিদ মুসলিমও যখন না জেনে না বুঝে কুফরী কথা বলে ফেলে, তখন তার ভুল সম্বন্ধে অবহিত করা হলে সে যদি সেটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তা হলে সে কাফের হবে না, যেমন বানী ইসরাইল করেছিল এবং যারা 'যাতে আনওয়াত' এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করেছিল।

আর এর থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তারা কুফরী না করলেও তাদেরকে কঠোর ভাবে ধমকাতে হবে যেমন নবী (ﷺ) করেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমা মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়

[যারা মনে করে যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে বলাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলেও ক্ষতি নেই, তাদের উক্তি ও যুক্তির খন্ডন]

মুশরিকদের মনে আর একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাহল এই যে, তারা বলে থাকে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রাঃ) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (ﷺ) সেই হত্যাকান্ডটাকে সমর্থন করেননি।

এইরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেনঃ “আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।”

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাদেরকে ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলত।

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল; তারা নামাযও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত।

ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায় তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।

তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে না।

হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

> "হে মু'মিন সমাজ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে বহির্গত হও, তখন (কাহাকেও হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখিও।" (সূরা নিসা ৪: ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ় ভাবে সুনিশ্চিত হইও। এই আয়াত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।
তদন্তের পর যদি তার ইসলাম বিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, (ফাতাবাইয়্যানূ) অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ।

তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে। যদি এই অবস্থাতে হত্যা না করা হয় তা হলেঃ 'ফাতাবাইয়ানু' তাসাব্বুত (অর্থ) অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোন অর্থ হয়না।

এইভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে।

এ কথার দলীল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "তুমি হত্যা করেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও ?

এবং তিনি আরও বলেছিলেনঃ 'আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।
সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ
অর্থাৎ "যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।" (বুখারী ও মুসলিম)

যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করত যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলানায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু এসব কোনই উপকারে আসল না তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরী'আতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেলে।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী (ﷺ) বানী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবেনা।
এই সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেনঃ

> **"হে মুমিন সমাজ! যখন কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন গুরুতর সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে।" (**সূরা হুজরাত ৪৯: ৬)

জেনে রাখ, উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এইরূপে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যে সমস্ত হাদীসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য

[উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট তার আয়ত্তাধীন বিষয়ে সাহায্য কামনা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট তার ক্ষমতার অতীত বিষয়ে সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য।]

তাদের (মুশরিকদের) মনে একটি সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে আছে। আর তা হচ্ছে এইঃ নবী (ﷺ) বলেছেন, লোক সকল কিয়ামত দিবসে তাদের (হয়রান পেরেশানীর অবস্থায়) প্রথমে সাহায্য কামনা করবে হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট, তারপর নূহ (আঃ)-এর নিকট, তারপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট, অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট।
তারা প্রত্যেকেই তাদের অসুবিধার উল্লেখ করে ওযর পেশ করবেন, শেষ পর্যন্ত তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গমন করবেন।

তারা বলেঃ এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া শিরক নয়।

আমাদের জওয়াব হচ্ছেঃ আল্লাহর কি মহিমা। তিনি তাঁর শত্রুদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।
সৃষ্ট জীবের নিকটে তার আয়ত্বাধীন বস্তুর সাহায্য চাওয়ার বৈধতা আমরা অস্বীকার করি না।
যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় বলেছেনঃ

> "তখন তার সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুপক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।" (সূরা কাসাস ২৮: ১৫)

মানুষ তার সহচরদের নিকটে যুদ্ধে বা অন্য সময়ে ঐ বস্তুর সাহায্য চায় যা মানুষের আয়ত্বাধীন। কিন্তু আমরা তো ঐরূপ সাহায্য প্রার্থনা অস্বীকার করেছি যা ইবাদত স্বরূপ মুশরিকগণ করে থাকে ওলীদের কবর বা মাযারে, অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন সব ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করে যা মঞ্জুর করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই।

যখন আমাদের এ বক্তব্য সাব্যস্ত হল, তখন নবীদের নিকটে কিয়ামতের দিন এ প্রার্থনা জানাবেন যাতে তিনি জান্নাতবাসীর হিসাব (সহজ ও শীঘ্র) সম্পন্ন করে হাশরের ময়দানে অবস্থানের কষ্ট হতে আরাম দান করেন, এ ধরনের প্রার্থনা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই সিদ্ধ। যে

মন জীবিত কোন নেক লোকের নিকটে তুমি গমন কর, সে বলেঃ আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দু'আ করুন। যেমন নবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাঁর জীবিতকালে তাঁর নিকট অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে এই ধরনের অনুরোধ কনো তারা জানাননি।

বরং সালাফুস সালেহ বা পূর্ববর্তী মনীষিগণ তাঁর কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে (এবং সেটাকে অবাঞ্ছিত কাজ মনে করে তাতে সম্মতি দিতে) অস্বীকার করেছেন। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে কি করে স্বয়ং তাঁকেই বা তাঁদেরকেই ডাকা যেতে পারে?

তাদের মনে আর একটা সংশয় রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনায়। যখন তিনি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন শুন্যলোক হতে জীব্রাইল (আঃ) তাঁর নিকট আরয করলেন, "আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?"
তখন ইবরাহীম (আঃ) বলেছেনঃ "যদি বলেন, আপনার নিকটে, তবে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।"

তারা (মুশরিকরা) বলেঃ জিব্রাইল (আঃ) নিকট সাহায্য কামনা করা যদি শিরক হত তাহলে তিনি কিছুতেই হযরত হবরাহীম (আঃ)-এর নিকট উক্ত প্রস্তাব পেশ করতেন না।
এর জওয়াব হচ্ছেঃ এটা প্রথম শ্রেণীর সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত। কেননা জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে এমন এক ব্যাপারে উপকৃত করতে চেয়েছিলেন যা করার মত ক্ষমতা ছিল তার আয়ত্ত্বাধীন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে **'শদীদুল কু-আ'** অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড এবং তার চারদিকের জমি ও পাহাড় যা কিছু ছিল সেগুলো ধরে পূর্বে ও পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করতে যদি আল্লাহ অনুমতি দিতেন তা হলে তিনি তা অবশ্য করতে পারতেন।

যদি আল্লাহ ইবরাহিম (আঃ) কে দুশমনদের নিকট থেকে দূরবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত করতে আদেশ দিতেন, তাও তিনি অবশ্যই করতে পারতেন আর আল্লাহ যদি তাকে আকাশে তুলতে বলতেন, তাও তিনি করতে সক্ষম হতেন।

তাদের সংশয়ের বিষয়টি তুলনীয় এমন একজন বিত্তশালী লোকের সঙ্গে যার প্রচুর ধন দৌলত রয়েছে। সে একজন অভাবগ্রস্ত লোক দেখে তার অভাব মিটানোর জন্য তাকে কিছু অর্থ ধার সরূপ দেওয়ার প্রস্তাব করল অথবা তাকে কিছু টাকা অনুদান স্বরূপ দিয়েই দিল।

কিন্তু সেই অভাবগ্রস্ত লোকটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং কারোর কোন অনুগ্রহের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর রিযিক না পৌঁছা পর্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করল।

তা হলে এটা বান্দার নিকট সাহায্য কামনা এবং শিরক কেমন করে হল ? আহা যদি তারা বুঝত।

ষোড়শ অধ্যায়
শরয়ী ওযর ছাড়া কায়মনেবাক্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য্যতা

আমি এবার ইনশা'আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে আমার বক্তব্যের উপসংহার টানব।
পূর্ব আলোচনা সমূহের এ বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়েছে বটে কিন্তু তার বিশেষ গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তৎসম্পর্কে অধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমি উক্ত বিষয়ে এখানে পৃথক ভাবে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব।

এ বিষয়ে কোনই দ্বিমত নেই যে, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি হতে হবে অন্তর দ্বারা, রসনা দ্বারা এবং তার বাস্তবায়ন দ্বারা। এর থেকে যদি কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে, তবে সে মুসলমান হিসেবে বিবেচ্য হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি তবে তাওহীদ কী- তা হৃদয়ঙ্গম করে কিন্তু তার উপর আমল না করে, তবে সে হবে হঠকারী কাফের, তার তুলনা হবে ফিরাউন, ইবলীস প্রভৃতির সঙ্গে। এখানেই অধিক সংখ্যক লোক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা বলে থাকেঃ এটা সত্য, আমরা এটা বুঝছি এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যও দিচ্ছি।

কিন্তু আমরা তা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম নই। আর আমাদের দেশবাসীদের নিকট তা সিদ্ধ নয়- কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী (তারা ছাড়া)। এই সব অযুহাত এবং অন্যান্য ওযর আপত্তি তারা পেশ করে থাকে।

আর এই হতভাগারা বুঝেনা যে, অধিকাংশ কাফের নেতা এ সত্যটা জানত কিন্তু জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু কতিপয় ওযর আপত্তির জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

> "আল্লাহর আয়াতগুলোকে তারা বিক্রয় করে ফেলেছে নগন্য মূল্যের বিনিময়ে।" (সূরা আত-তওবা ৯: ৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

> "তারা তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-কে) ঠিক সেই ভাবেই চিনে যেমন তারা চিনে তাদের পুত্রদেরকে।" (সূরা বাকারা ২: ১৪৬)

আর কেউ যদি তাওহীদ না বুঝে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার উপর আমল করে অথবা সে যদি অন্তরে বিশ্বাস না রেখে আমল করে তবে তো সে মুনাফিক, সে নিরেট কাফের থেকেও মন্দ।
স্বয়ং আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি সম্বন্ধে বলেছেনঃ

> "নিশ্চয় মুনাফিকদের অবস্থান হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।" (সূরা আন-নিসা ৪: ১৪৫)

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, অতীব দীর্ঘ ও ব্যাপক, তোমার নিকটে এটা প্রকাশ হয়ে যাবে যখন জনসাধারণের আলোচনার উপর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখবে, তখন তুমি দেখবে সত্যকে জেনে বুঝেও তারা তার উপরে আমল করে না এই আশঙ্কায় যে, তাদের পার্থিব ক্ষতি হবে।

তুমি আরও দেখতে পাবে যে, কতক লোক প্রকাশ্য ভাবে কোন কাজ করছে কিন্তু তাদের অন্তরে তা নেই। তাকে তার অন্তরের প্রত্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে দেখবে যে, সে তাওহীদ কি তা বুঝে না।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে মাত্র দুটি আয়াতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা তোমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম আয়াতটি হচ্ছেঃ

> "এখন তোমরা আর কৈফিয়ত পেশ করো না, ঈমান আনয়নের পরও তোমরা কুফরী কাজে লিপ্ত রয়েছ।" (সূরা তাওবা ৯: ৬৬)

যখন এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, কতিপয় সাহাবী যারা রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে রূমের (তাবুকের) যুদ্ধে গমন করেছিল তারা ঠাট্টাচ্ছলে কোন কথা বলার জন্য কাফের হয়ে গিয়েছিল।
আর এটাও তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হাসি ঠাট্টার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অধিক গুরুতর সেই ব্যক্তির কথা যে কুফরী কথা বলে অথবা ধনদৌলতের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা সম্মান হানি অথবা সম্পর্কের ক্ষতির ভয়ে কুফরীর উপরে আমল করে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছেঃ

> "কেহ তার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উম্মুক্ত রাখল, তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তিঃ তবে তার জন্য নহে যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত।
> এটা এই জন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়।" (সূরা নাহল ১৬: ১০৬-১০৭)

আল্লাহ এদের কারোরই ওযর আপত্তি কবুল করবেন না, তবে কবুল করবেন শুধু তাদের ওযর আপত্তি যাদের অন্তর ঈমানের উপরে স্থির ও প্রশান্ত রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে জবরদস্তী বাধ্য করা হয়েছে। এরা ছাড়া উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের ঈমানের পর কুফরী করেছে।

চাই তারা ভয়েই তা করে থাকুক অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় তা হোক কিংবা তার দেশের বা স্বজনদের প্রতি অনুরাগের জন্যই হোক কিংবা গোত্র অথবা হাসি ঠাট্টার ছলেই কুফরী কালাম উচ্চারণ করুক অথবা এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তা করে থাকুক কিন্তু বাধ্যবাধকতা ছাড়া। সুতরাং বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থই বুঝিয়ে থাকে দু'টি দৃষ্টি কোণ থেকে।

প্রথমতঃ আল্লাহর সেই বাণী যাতে বলা হয়েছেঃ "কিন্তু যদি তাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে।" আল্লাহ বাধ্যকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখেন নাই। একথা সুবিদিত যে, মানুষকে একমাত্র কথা অথবা কাজের মাধ্যমেই বাধ্য করা যায়। কিন্তু অন্তরের প্রত্যয়ে কাউকে বাধ্য করা চলে না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর বাণীঃ

> "ইহা এই জন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়।" (সূরা নাহল ১৬: ১০৭)

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই কুফরী ও তার শাস্তি তাদের 'ই'তেকাদ' মূর্খতা, দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ বা কুফরীর প্রতি অনুরাগের কারণে নহে, বরং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে দুনিয়া থেকে কিছু অংশ হাসিল করা, এই জন্য সে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

পাক পবিত্র ও মহান আল্লাহই এ সম্পর্কে অধিক অবহিত রয়েছেন আর সকল প্রশংসা জগত সমূহের রব আল্লাহর জন্য।

আর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বর্ষিত করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর ও তাঁর পরিবার ও সহচরবর্গের উপর এবং তাঁদের সকলের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। আমীন।